ধর্মভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন ও বাংলাদেশের নারীসমাজ : একটি পর্যালোচনা

পি. এম. সিরাজুল ইসলাম

কোনো নারী বা পুরুষের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে মৃতের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের খরচ, দেনাশোধ বা মৃতব্যক্তি যদি কোনো উইল সম্পাদন করে যান তবে তা হস্তান্তরের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তার ওপর মৃতের সন্তান-সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনের যে অধিকার জন্মায়, তাকে উত্তরাধিকার বলে। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাতে হয়, বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীরা সমানাধিকার পাচ্ছে না। মুসলিম নারীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে, তবে নারী-পুরুষ সমান পাচ্ছে না। খ্রিষ্টান নারীরা বাবার সম্পত্তিতে সমান ভাগ পায়। হিন্দু নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারীই হয় না। তবে সম্প্রতি উচ্চতর আদালতের একটি সিদ্ধান্তের আলোকে তারা আশার মুখ দেখতে চলেছে। আইন কমিশন ২০১২ সালে হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের সুপারিশ-বিষয়ক চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে এ আইন সংস্কার না হওয়ার পেছনে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। তারপরও হিন্দু নারীরা শুধু সীমিত স্বার্থে ও শর্তসাপেক্ষে সম্পত্তির মালিক হন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীদের বেলায় সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ চলে নিজস্ব প্রথাগত আইনে। তবে সাঁওতাল নারীরা বাবা বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো ভাগ পায় না।

২০১৩ সালে আইন কমিশন বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের পর্যালোচনা ও সুপারিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলেছে, প্রত্যেক ধর্মে প্রচলিত পারিবারিক আইন নারীর প্রতি কম-বেশি বৈষম্যমূলক। এতে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। এই বৈষম্য যতটা না আইনের মূল উৎসের কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসের আক্ষরিক, প্রেক্ষাপটহীন ও স্বার্থবাদী ব্যাখ্যার কারণে।

সব নাগরিকের সমান অধিকার রক্ষার ধারক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ২৮-এর অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'– এর অর্থ দাঁড়ায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ।

অথচ বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন। সংবিধানের সঙ্গে বিরোধ টিকিয়ে রেখে উত্তরাধিকার ও সন্তানের ওপর কর্তৃত্বের বিষয়টি বিভিন্ন ধর্মের আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন : ইসলামে বাবা-মা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়া হয়েছে। নারী পায় পুরুষের অর্ধেক পরিমাণ সম্পত্তি। স্বামীর সম্পত্তির ওপরও মেয়েদের ভাগ আছে। স্বামী

সন্তান রেখে মারা গেলে স্ত্রী পায় ৮ ভাগের ১ ভাগ। আর সন্তান না রেখে মারা গেলে পায় ৪ ভাগের ১ ভাগ।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন : হিন্দু আইনে নারীকে ন্যূনতম সম্পত্তির অধিকারও দেওয়া হয় নি। বাবা বা স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। মেয়েকে বিয়ের সময় যে উপহার (স্ত্রীধন) দেওয়া হয়, সেটিই মেয়ের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। শুধু তাই নয়, বিয়ে বিচ্ছেদ বলে হিন্দু আইনে কিছু নেই। স্বামী-স্ত্রীর মতের অমিল হলে দুজন আলাদা থাকতে পারে কিন্তু কিছুতেই বিচ্ছেদ নয়। বিয়ে মানেই নারীকে স্বামীর কাছে সমর্পিত হতে হবে। তবে সাম্প্রতিক রায়ের পর হিন্দু আইন অনুযায়ী হিন্দু নারীরা কিছু শর্তসাপেক্ষে সম্পত্তির মালিক হন।

বৌদ্ধ ধর্মেও নারী অধস্তন : বৌদ্ধ সমাজ সাধারণত হিন্দু আইন মেনে চলে। তাদের আলাদা কোনো আইন নেই। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মেও নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিয়ে বিচ্ছেদেরও উপায় নেই।

খ্রিষ্টান ধর্মে সম্পত্তিতে সমানাধিকার : আমাদের দেশে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫-এর মাধ্যমে। কোনো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে একই মর্যাদার অধিকারী, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তারা সমান অংশ লাভ করে। তবে মৃত ব্যক্তি যদি সম্পত্তি অন্য কারো নামে উইল করে যান, তাহলে সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। এই ধর্মে বিয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন প্রথা চালু আছে। এখানে চার্চের ভূমিকাই প্রধান।

নির্দিষ্ট কাঠামো নেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীদের : ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীদের বেলায় সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ চলে নিজস্ব প্রথাগত নিয়মে। মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থায় নারীরা বাবা ও স্বামীর সম্পত্তি পায়; যেমন গারো ও খাসিয়া নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। আর চাকমাদের মধ্যে পুত্র না থাকলেই কেবল কন্যারা উত্তরাধিকারী হয়।

হিজড়াদের উত্তরাধিকার : উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় হিজড়াদের। অথচ এটি তাদের প্রাপ্য। অন্যান্য ধর্মের পারিবারিক আইনে হিজড়াদের সম্পর্কে কোনো কথা না থাকলেও ইসলাম ধর্মে তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শারীরিক গঠন ও আচরণে পুরুষালি স্বভাব বেশি থাকলে পুরুষ এবং নারী স্বভাব বেশি থাকলে নারী হিসেবে হিজড়াদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি দেওয়ার কথা বলা আছে।

সিডও সনদের সংরক্ষিত দুটি ধারা

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর গৃহীত সিডও সনদ বা নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসন সনদ ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়। এই সনদকে বল হয় উইমেনস বিল অব

র‍্যাবিটস। এতে ৩০টি ধারা রয়েছে, যার ১ থেকে ১৬ নম্বর পর্যন্ত নারী-পুরুষের সমতা সংক্রান্ত নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে।

সিডও সনদের ২ ও ১৬ নম্বর ধারা আমাদের দেশে অনুমোদন করা হয় নি। ২ নম্বর ধারায় বলা আছে, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসনে শরিক দেশগুলো আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে এবং আইনের সংস্কার করবে। ১৬.১ (গ) ধারায় বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা আছে।

এই দুটি ধারা অনুমোদন না করার পেছনে রাষ্ট্রের যুক্তি হলো, এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এখানে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে তালাক ও সম্পত্তি বণ্টন করা হয়। সিডও সনদের সম্পূর্ণ অনুমোদন দিলে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে।

সকল মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একরকম নিয়ম আর পারিবারিক ক্ষেত্রে আরেক ধরনের নিয়ম চালু আছে। অর্থাৎ সরকারি নিয়মের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ধনী বা গরিবে পার্থক্য নেই; যেমন, একজন নারী গাড়ি কিনতে গেলে যে পরিমাণ ভ্যাট দিতে হয়, একজন পুরুষেরও তাই দিতে হয়। তবে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন একেক ধর্মে একেকরকম। এরকম চলতে পারে না। কাজেই নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের জন্য আনা সিডও সনদের মূল দুটি ধারা অনুমোদন না দেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর না দেওয়াকে উৎসাহিত করা মোটেও উচিত নয়।

সংবিধানের ৭(২) ধারায় বলা হয়েছে 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' দুঃখজনকভাবে, এর পরেও উত্তরাধিকার সম্পত্তি আইনে ধর্মীয় আইন বহাল রয়েছে।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নীতিমালার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়, 'নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ-প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।'

পরবর্তী সময়ে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিমালার 'উত্তরাধিকার', 'সম্পদ' এবং 'ভূমির উপর অধিকার' কথাটি বাদ দিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে।

পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯৭ ও ২০০৪ সালের নীতিমালার আলোকে 'উত্তরাধিকার' এবং 'ভূমির উপর অধিকার' শব্দগুলো বাদ দিয়ে 'বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ' কথাটি যোগ করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ঘোষণা করে।

এরপর প্রণীত হয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, যে নীতি বর্তমানে বহাল রয়েছে। এই নীতিতেও উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান অধিকার না দিয়ে, 'উত্তরাধিকার' সূত্রে পাওয়া এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তিতে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক।

সংবিধানের ২৮ ধারায় ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলা হলেও বাস্তবে তার উলটোটাই ঘটছে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আইন পরিবর্তন হলেও উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এখনো ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। যে আইনের বিধিবিধান মেনে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সংবিধানের কাজ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ। কিন্তু সেখানে আমরা ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় সব আইনই প্রণীত হয়েছে সংবিধানের আলোকে ইউরোপীয় সিভিল আইনের আদলে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষা/চর্চা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে। শুধু নারী অধিকার খর্বকারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইন হচ্ছে ধর্মীয় আইননির্ভর। একটি স্বাধীন দেশে এমন দ্বৈত ব্যবস্থা সংবিধান আমলে না নেওয়ারই শামিল।

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১০, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারাসমূহে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাই শরিয়া আইন ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণের দোহাই দিয়ে সিডও সনদের দুটি ধারার ওপর সংরক্ষণ আরোপ করা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের সাংবিধানিক নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের আলোকে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন করে বা আইনের সাহায্যে সাংবিধানিক অধিকারবলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ধারা দুটির ওপর সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা অপরিহার্য।

সিডও সনদ নারী অধিকারের আন্তর্জাতিক বিল হিসেবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক সনদ সিডওতেই প্রথমবারের মতো তুলে ধরা হয় নারীর অধিকার মানবাধিকার। সাধারণত নারী-পুরুষ সমতা নারী ও পুরুষের সমঅবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা সমঅধিকার, সমমর্যাদা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতিকে নির্দেশ করে।

একজন মানুষ হিসেবে, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ অধিকার আছে। লেখাপড়া, চাকরি, সম্পত্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মতপ্রকাশ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, আইনি অধিকার, মজুরি, ভোটাধিকার, তালাক প্রদান ইত্যাদিতে পুরুষের মতোই নারী তার প্রাপ্য অধিকার পাবে; যেখানে নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন পৈতৃক সম্পত্তি

বা উত্তরাধিকার, বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয়। প্রচলিত কিছু আইনের দোহাই দিয়ে সংবিধানকে অকার্যকর রেখে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। ফলে নারী সংবিধানের বদৌলতে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

(১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

পরিতাপের বিষয় হলো, জাতিসংঘের নানা মানবতাবাদী তৎপরতা ও মানবতাবাদীদের অবিরত তাত্ত্বিক ও সামাজিক ব্যাখ্যার পরও সমাজ জীবনে নারীসমাজের সমান অধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাম্য স্বস্তি এখনো বহুদূর। সমাজের অভ্যন্তরে এমন অস্বস্তি, দূরত্ব এবং বৈষম্য বজায় রেখে কি বলা যায় যে দেশ সংবিধানের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে?

১৯৩৭ সালের হিন্দু আইন অনুযায়ী মেয়েরা কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়। তবে বিধবা হওয়ার পর সন্তান নাবালক থাকা অবস্থায় শুধু বসতবাড়ির অধিকারী হয়। সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট রায়ে বলেছেন, হিন্দু বিধবা নারীরা শুধু বসতভিটা নয়, স্বামীর সব সম্পত্তিতে ভাগ পাবেন। দীর্ঘ ৮৪ বছর পর হিন্দু আইনের এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দু উইমেন্স রাইটস টু প্রোপার্টি অ্যাক্ট, ১৯৩৭ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হলো। এর আগে ২০২০ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিলেন, হিন্দু বিধবারা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তবে প্রাপ্ত সম্পত্তি কোনো প্রকার বিক্রি বা হস্তান্তরযোগ্য নয়। শুধু ভোগদখলকৃত বলে গণ্য হবে।

১২ অক্টোবর ২০২১ মহামান্য হাইকোর্ট রায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ সব সম্পত্তি যেখানে স্থাবর বা অস্থাবর, বসতভিটা, কৃষিভূমি, নগদ টাকা বা অন্য কোনো ধরনের সম্পত্তি। কৃষিজমি ও বসতভিটার মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ নেই এবং এ ধরনের সম্পত্তি বিধবার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়।

যে ঘটনা থেকে হিন্দু নারীর জীবন ও সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণে আদালতের এ উদ্যোগ, সে গল্পটি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

খুলনার রাজবিহারী মণ্ডলের দুই ছেলে। তাঁরা হলেন জ্যোতিন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অভিমন্য মণ্ডল। অভিমন্য মণ্ডল ১৯৫৮ সালে মারা যান। এ অবস্থায় মৃত ভাইয়ের স্ত্রী (গৌরী দাসী) কৃষিজমি পাবেন না, শুধু বসতভিটা থেকে অর্ধেক পাবেন– এমন দাবি নিয়ে ১৯৮৩ সালে নিম্ন আদালতে মামলা

করেন জ্যোতিন্দ্রনাথ। মামলায় যথাযথভাবে পক্ষ না করায় ১৯৯৬ সালে তা খারিজ করে রায় দেন আদালত। তবে গৌরী কৃষিজমির সম্পত্তি পাবেন না বলে পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে খুলনার যুগ্ম জেলা জজ আদালতে আপিল করেন জ্যোতিন্দ্রনাথ। আদালত ২০০৪ সালের ৭ মার্চ রায় দেন। রায়ে বসতভিটা ও কৃষিজমিতে গৌরী দাসীর অধিকার থাকবে বলা হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালে হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করেন জ্যোতিন্দ্রনাথসহ অন্যরা।

হাইকোর্ট রায়ে বলেন, রাজবিহারী মণ্ডলের আগে তার পুত্র অভিমন্য মারা যান। গৌরী দাসী অভিমন্যর বিধবা স্ত্রী। বিবাদী গৌরী শুধু বসতভিটার উত্তরাধিকারী এবং তাকে কৃষিজমি থেকে বঞ্চিত করার কারণ দেখা যাচ্ছে না। শ্বশুর মারা যাওয়ার পর তাঁর রেখে যাওয়া বসতভিটায় বাস করছিলেন গৌরী এবং আপাতদৃষ্টিতে জীবনধারণের জন্য শ্বশুরের কৃষিজমির ওপর নির্ভরশীল তিনি। এই মামলার বিবাদী গৌরী দাসীর ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের দায়ভাগা পদ্ধতি প্রযোজ্য। ১৯৩৭ সালের আইনের ৩(১) ধারা অনুসারে, বাবার আগে মারা যাওয়া ছেলের মতোই তিনি (গৌরী) তাঁর শ্বশুরের রেখে যাওয়া সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবেন।

আইনের এই অসমতাকে দূর করতে সম্পত্তিতে হিন্দু নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আদায়ে মহামান্য হাইকোর্টের এ রায় মাইলফলক হয়ে থাকবে।

পি. এম. সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, আইনগ্রন্থ প্রণেতা এবং পিএইচডি গবেষক, আইন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। seraj.pramanik@gmail.com